গীতবিতান-এর পূজা পর্যায় : প্রসঙ্গ পথ

ইয়াতসিংহ শুভ*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী *গীতবিতান*-এর গানগুলোকে প্রধানত ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। যেমন– পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক প্রভৃতি পর্যায়। স্বদেশ, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক পর্যায় বাদে বাকি পর্যায়গুলো একাধিক উপপর্যায়ে বিভক্ত। সর্বাধিক সংখ্যক গান রয়েছে যে পূজা পর্যায়ে, তার বিশটি উপপর্যায়ের মধ্যে একটি হলো 'পথ' উপপর্যায়। এই উপপর্যায়ের গানগুলো প্রধানত 'পথ' সংক্রান্ত হলেও পূজা পর্যায়ের অন্যান্য গানেও পথের প্রসঙ্গ নানাভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। গানগুলোতে পথ কখনো অনন্ত অসীমের চির প্রবহমান জীবনধারার মাধ্যম, কখনো অসীমের সঙ্গে সসীমের মিলনের উপায়, কখনো চিরকালের বন্ধু তথা ঈশ্বরের মানবের পথের সঙ্গী হয়ে ধরার ধূলিতে নেমে আসার রূপক। এভাবে 'পথ' শব্দটি প্রয়োগভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করে। বাংলা গানের ধারায় বাউল, কীর্তনসহ সুফি মতাদর্শী রচনায়ও 'পথ' দ্বারা বৈচিত্র্যময় তত্ত্বের প্রকাশ রয়েছে, যার প্রভাব দেখা যায় পূজা পর্যায়ের এমনি কিছু গানে। পূজা পর্যায়ের এই গানগুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথ' সংক্রান্ত দর্শনের একটি রূপরেখা খোঁজার প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল ভান্ডারে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে সুরে, তেমনই গানের বাণীতে, শব্দচয়নে। গানগুলোতে এমন অনেক শব্দ আছে, যা ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, কিছু কিছু বিষয়ে কবির নিজস্ব চিন্তাধারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে এবং অন্যান্য রচনার মতো গানেও তার ছাপ পড়েছে স্পষ্টরূপে। এমনকি, গানে এমন অনেক জীবনদর্শনের পরিবর্তনের রূপ চোখে পড়ে, যা অন্যান্য রচনায় প্রচ্ছন্ন। তাই জীবন, মানুষ, প্রকৃতি প্রভৃতি নিয়ে তাঁর চিন্তাধারা বোঝার জন্য শুধু রবীন্দ্রসংগীত শোনা নয়, বরং *গীতবিতান* পাঠ করাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে 'পথ'। পথের নেশা যেমন কবির বাউল মনকে করেছে ঘরছাড়া, তেমনি পথের টানে ছুটে আসা সবাইকে যুক্ত করেছে এক অভিন্ন বন্ধনে। গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথ কখন যেন মিশে যায় বিশাল বিপুল বিশ্বজগতের চিরন্তন পথের সঙ্গে, কখনো মহামানবের আগমনধ্বনি শোনা যায় ঐ পথের ধূলার 'পরে। এভাবে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে 'পথ' নিয়ে তাঁর ভাবনা বেশ বিস্তৃত রূপ পেয়েছে। কিন্তু 'পথ' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর গানে। হয়তো এ জন্য *গীতবিতান*-এর পূজা পর্যায়ের একটি উপপর্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে 'পথ'।

পূজা পর্যায়ে 'পথ' নিয়ে রচিত গান নিয়ে পর্যালোচনার আগে *গীতবিতান*-এর পর্যায় ও উপপর্যায় সম্পর্কে ধারণা প্রদান আবশ্যক। *গীতবিতান*-এর বর্তমান রূপটি কবির দেওয়া। তবে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের সময় এমন ছিল না। প্রথম প্রকাশের সময় প্রকাশকের ইচ্ছেমতো গানের ক্রম সাজানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নতুন অনেক গান যুক্ত করে এবং

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সকল গান ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিন্যস্ত করে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে দুই খণ্ডে পুনরায় প্রকাশ করেন। এতে গানগুলি মোট ছয়টি পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ হয়। তার মধ্যে পূজা, প্রেম এবং প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলো একাধিক উপপর্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। কবিগুরু নির্দেশিত পর্যায় এবং উপপর্যায়ের তালিকাটি হলো :

১. পূজা পর্যায়। উপপর্যায় : গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়।
২. স্বদেশ পর্যায়। উপপর্যায় নেই।
৩. প্রেম পর্যায়। উপপর্যায় : গান, প্রেমবৈচিত্র্য।
৪. প্রকৃতি পর্যায়। উপপর্যায় : সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।
৫. বিচিত্র পর্যায়। উপপর্যায় নেই।
৬. আনুষ্ঠানিক পর্যায়। উপপর্যায় নেই।

(সন্‌জিদা, ২০১২ : ১৯১)

রবিঠাকুরের মৃত্যুর পরে *গীতবিতান*-এর তৃতীয় খণ্ডে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, নাট্যসংগীত, জাতীয় সংগীত, পূজা ও প্রার্থনা, আনুষ্ঠানিক সংগীত, প্রেম ও প্রকৃতি– এই বিভাগগুলো এবং গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য সংযুক্ত হয়।

গীতবিতান-এর প্রধান ছয়টি পর্যায়ের মাঝে 'পূজা' পর্যায়ে গান আছে ৬২১টি, যা সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বাধিক।

'পূজা' শব্দটি দ্বারা সাধারণত বোঝায় ফুল-পাতা-জল-অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমার সামনে আরাধনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'পূজা' দ্বারা প্রতিমার প্রসঙ্গ নির্দেশ করেননি। বরং এ পর্যায়ের গানগুলো ঈশ্বরচিন্তা, জীবনদর্শন, আত্মচিন্তা, মোক্ষ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে নির্ভর করে রচিত হয়েছিল। রামমোহন রায় প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রসারিত ব্রাহ্মধর্মেও প্রতিমা পূজা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম জীবনে রবিঠাকুর একনিষ্ঠভাবে এই ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং শেষ দিকে এসে নিজের মাঝে ধর্মচিন্তার এক নতুন রূপ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তাঁর প্রদত্ত 'পূজা' নামকরণে প্রতিমা পূজা, ব্রহ্ম কিংবা ভগবানের স্তুতি– কোনোটিই এককভাবে প্রকাশ না পেয়ে তাঁর জীবনব্যাপী ঈশ্বরচিন্তা ও সীমা-অসীমের সম্পর্কের বিচিত্র ভাবনাগুলি স্থান পেয়েছে। এখানে ঈশ্বর কখনো মহা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ, কখনো পরম পিতা, কখনো বন্ধু, আবার কখনো পথিকবেশে পান্থজনের সখা।

পূজা পর্যায়ের উপপর্যায়গুলোর ক্রমবিন্যাস লক্ষ করলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবসত্তার সম্পর্কের স্তরগুলোর আভাস পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম উপপর্যায় হলো 'গান'। এ উপপর্যায়ের গানে গান ও সুরের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তথা বিশ্বমানব ও প্রকৃতির সঙ্গে পরম আরাধ্যের সম্পর্কের বিষয়টি ফুটে ওঠে। পরবর্তী অনুবিভাগ 'বন্ধু'। জীবনের নানা পর্যায়ে ঈশ্বরকে দূরের লক্ষ না ভেবে অন্তরাত্মার পরম বন্ধু বলে অনুভব করার গানগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে। পরবর্তী 'প্রার্থনা' উপপর্যায়ে সেই পরম বন্ধু তথা আরাধ্যকে জীবনে উপলব্ধি করে জীবনকে ভরিয়ে তোলার আশা জানানো হয়েছে। এরপর আসে 'বিরহ'। সৃষ্টির মাঝে চিরকালের বিরহমাখা পথযাত্রার বাণী নিয়ে রচিত এ উপপর্যায়ের গানগুলো। এই সত্য অনুধাবনেই আসে 'সাধনা ও

সংকল্প'। জীবনব্যাপী সাধনা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে পথ চললে তবেই আসে প্রাপ্তি। কিন্তু সে পথে চিরসঙ্গী হয়ে থাকে দুঃখ। এই দুঃখবোধ জীবনকে কান্নায় নয়, বরং নিবেদনের প্রত্যাশায় পূর্ণ করে। দুঃখের পরে আসে 'আশ্বাস'। অর্থাৎ, ঈশ্বরকে সঙ্গী করে জীবনযাত্রার পথ খোঁজা। এই বোধ জাগ্রত হলেই মানুষ তাকায় 'অন্তর্মুখে'। নিজের আত্মাকে অনুভবের দ্বারা হয় 'আত্মবোধন'। এর ফলে হয় 'জাগরণ'। আত্মবোধের জাগরণ হলে 'নিঃসংশয়' হয়ে ঈশ্বরের পথে রাখা যায় দৃষ্টি। অতঃপর মানবমন পরিণত হয় 'সাধকে'। এই আত্ম-অনুভবেই মিলনের 'উৎসব', 'আনন্দ'। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন দৃষ্টিগোচর হয় এবং জীবনে আসে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা নিয়ে উপপর্যায় 'বিশ্ব'। পরবর্তী উপপর্যায়ে এমনি কোনো নির্দিষ্ট রূপ ধরা পড়ে না। তাই তার নাম 'বিবিধ'। বিবিধ গানের পরে চারটি উপপর্যায় রয়েছে। এ উপপর্যায়গুলো স্বতন্ত্রভাবে একেকটি ভাব প্রকাশ করে। উপপর্যায়গুলো হলো : সুন্দর, বাউল, পথ এবং শেষ। এর মধ্যে 'পথ' উপপর্যায়ে এমন কিছু গান সন্নিবিষ্ট, যেখানে জীবনের পথকে, ভাবনার পথকে, দর্শনের পথকে নানা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

'পথ' শিরোনামে একটি উপপর্যায় থাকলেও পূজা পর্যায়ের বাকি সব উপপর্যায়ে (অন্তর্মুখে, সাধক, উৎসব ব্যতীত) এই প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। 'পথ' একটি শব্দ হিসেবে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রসংগীতে অন্যান্য অনেকগুলি বিশেষ শব্দের ন্যায় এটিও ঘুরেফিরে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি 'পথকে' দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কবির মধ্যজীবন থেকে এই দর্শনের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। কেবল গানই নয়, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ঋতুনাট্য– সব ক্ষেত্রেই 'পথ' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় একটি অনুষঙ্গ তথা রূপকার্থক শব্দ। তার সঙ্গে আসে 'পথিক'। সমস্ত জীবনজুড়ে পথ ও পথিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অত্যন্ত বিচিত্র, নানামুখী, রূপকার্থক, ব্যঞ্জনাময়।

বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'পথ' শব্দটির অর্থ হলো রাস্তা, সরণি, ছিদ্র, দ্বার ,পন্থা, কৌশল, উপায়। 'পথিক' শব্দটির অর্থ হলো পথ দিয়ে বিচরণকারী, পর্যটক, পান্থ, মুসাফির। বাংলা সাহিত্য ও গানে এই প্রসঙ্গের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন, বাংলা ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদে* কাহ্নপা বলেছেন–

যে যে আইলা তে তে গেলা
অবনাগমণে কাহ্ন বিমনা ভইলা
কাহ্নকহি গোই করিম নিবাস
জো মন গোঅর সো উয়াস।

(আফসার আহমদ, রবীন্দ্রনাথের গানে
পথ ও পথিক, কালের খেয়া, ২ নভেম্বর ২০১৮)

দ্বাদশ শতাব্দীর কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দে* দেখা যায়, অভিমানিনী রাধা কৃষ্ণের পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু কৃষ্ণ যখন এলেন, রাধার মান যেন আর ভাঙেই না।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদু পবনে
কিমপরমধিক সুখং সখি ভবনে
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে।

(কবি জয়দেব, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্লোক : ২, নবম সর্গঃ)

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদাবলির যুগেও পথের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। রাধার কণ্টকাকীর্ণ পথে অভিসারে গমন, সেই পথের দুর্দশা বর্ণনার দ্বারা রাধার আকুতি প্রকাশ– প্রভৃতি বিষয়গুলো 'পদ' রচনার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব যখন বাংলায় কীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেন, সেটিরও উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন নগরের পথে। নামসংকীর্তন গেয়ে গেয়ে সাথীদের নিয়ে পথে ভ্রমণ করতেন তিনি। পরবর্তীকালে নরোত্তম ঠাকুর কীর্তনের কাঠামো নির্ধারণে গৌরচন্দ্রিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সারা বাংলা ধীরে ধীরে কীর্তনের জোয়ারে প্লাবিত হলো । তারপর অষ্টাদশ শতকে কবিগান, যাত্রা, তরজা গান প্রভৃতি নানা ধারার সংগীতের প্রচলন হলো বাংলায়। কিন্তু গীতিকবিতায় কাব্যের প্রয়োজনে অন্যান্য অনেক বহুল চর্চিত শব্দের সঙ্গে 'পথ' ও 'পথিক' বিশেষ গুরুত্ব পেল। অর্থাৎ , এই দুটি শব্দ বাংলা গানের আদি থেকে বর্তমান– সর্বদাই বহুল ব্যবহৃত বলে লক্ষ করা যাচ্ছে। সেই ধারায় আমরা রবীন্দ্রসংগীতেও 'পথ' প্রসঙ্গ নবতর রূপে দেখতে পাই। তবে রবিঠাকুর প্রধানত তিনটি উৎস থেকে 'পথ' সংক্রান্ত দর্শনের রসদ লাভ করেন। তা হলো : সুফিতত্ত্ব, কীর্তন, বাউল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুফিতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেন বলেন : "এইসব ভাব, অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্পর্ক স্থাপনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা, সসীমের সীমা প্রসারণের বা অসীমের সঙ্গে মিলনের প্রয়াস, এগুলো অবশ্যই সুফিভাব।" (মোতাহার, ২০১১ : ৫)

সুফিতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বা প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> রবীন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন দিওয়ান-ই-হাফিজের অমর গজলের অনুরাগী, তাঁদের বাড়িতে নানা ভাষাভাষী অতিথির সমাগম হত, গানের আসরও বসত। আর সেই যুগের বৃদ্ধেরা প্রায় সকলেই ফারসি জানতেন, কারণ কিছুকাল আগেও ফার্সিই ছিল রাজভাষা। বিশেষত কবির, দাদু, বুল্লাশাহ এবং বঙ্গদেশেও লালন শাহ, পাগলা কানাই, মদন বাউল প্রভৃতি সাধকগণ পল্লিগানের মধ্য দিয়ে মানুষের সহজ ধর্ম প্রচার করে গেছেন – যাকে বিশেষভাবে ইসলামী সাম্যনীতি ও একেশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত পৌরাণিক ধর্মের রূপান্তর বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাধক কবিরের একশত গানের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। (মোতাহার, ২০১১ : ৫)

ধর্মনিরপেক্ষ তত্ত্বদর্শী 'কবীর' প্রসঙ্গে রবিঠাকুর বলেন :

> তাহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তমান, তাহাদের ধর্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্মবোধ হইতে উৎসারিত। মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাহাদের কারবার। (মকসুদ, ২০১১ : ৫৭৮)

রবীন্দ্রসাহিত্য যে তত্ত্বগুলো সুফিবাদের সঙ্গে মিলে যায় তার অন্যতম হলো 'পথ'। এই পথ তথা রাহ্, পথিক তথা রাহী, মনজিল তথা গন্তব্য সুফিদের একটি বিশেষ রূপক। (প্রসাদ, ২০০৩ : ৫৮)

কীর্তনের প্রতি কবি খুব অল্প বয়সেই মুগ্ধ হন। 'ভানুসিংহের পদাবলীর' প্রথম পদ 'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে' মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রচনা করেন তিনি। জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদগুলো তাঁর ভীষণ পছন্দের বিষয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনহেতু রাধার অভিসার, সেই অভিসারের পথে নানা রকম বাধা সহাস্যে বরণ করা, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সেই যাত্রাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পরমাত্মা কৃষ্ণের পানে ছুটে চলা প্রভৃতি কবিগুরু খুব আগ্রহ সহকারে

পর্যালোচনা করেছেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী হয়েও 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' বলে বৈষ্ণব দর্শনের পথে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সংযোগের কথা বলেছেন। পূজা পর্যায়ের অনেক গানে কীর্তনের সুর, বৈষ্ণবপদাবলির দর্শন থাকলেও 'পথ' সংক্রান্ত দর্শন এ গানগুলোয় কম। এর চেয়ে বাউলতত্ত্বের প্রভাবে রচিত গানে 'পথ' শব্দটির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

বাউল মতাদর্শের সঙ্গে কবির পূর্বপরিচয় থাকলেও প্রথম আন্তরিকতা তৈরি হয় ১৮৮৯ সালে পূর্ববঙ্গে এসে। পিতার আদেশে তিনি জমিদারি দেখার কাজে প্রথমে শিলাইদহে আসেন, তারপর শাহজাদপুর। এতদঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রগুচ্ছে। একদম মাটির কাছাকাছি গ্রামীণ সমাজ নিয়ে লেখা তাঁর প্রায় সবগুলো রচনায় অবধারিতভাবে পূর্ববঙ্গের ছায়া পড়েছে। সেইসঙ্গে গান রচনায় পড়েছে পূর্ববঙ্গের বাউলদের প্রভাব। বাউলদের চিন্তাধারায় বৈষ্ণবদর্শন ও সুফিবাদ একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ফলে বাউলদের গানে শব্দপ্রয়োগের রূপকার্থক কৌশল একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। এরই আলোকে রবিঠাকুর বাউলদের 'মনের মানুষ', 'পথ' প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পূজা পর্যায়ের গানগুলোর রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'পথ' সংক্রান্ত গানগুলোর প্রথম কয়েকটি বাদে সবগুলো গানই ১৮৮৯ সালের পরে রচিত।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের খানিক আগে ও পরে কবিগুরু বাউল সুর ও দর্শনের সহায়তায় অনেকগুলো স্বদেশ পর্যায় এবং জাতীয় সংগীত পর্যায়ের গান রচনা করেন। এই সময়কালে পূজা পর্যায়ের গান খুব একটা দেখা যায় না। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সহিংস রূপ নিলে কবি ধীরে ধীরে সক্রিয় আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এর পরেই তাঁর রচনায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং জীবনদর্শনের প্রভূত বিচিত্র দিকগুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। জীবনপথের পথিক হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকুতি নিয়ে ১৯০৮ সালে রচিত 'শারদোৎসব' এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ঋতুনাট্যেই সর্বপ্রথম 'পথ' সম্পর্কিত রবীন্দ্রদর্শন একটি বিস্তৃত স্থান পেয়েছে। নাটকে দেখা যায়, রাজা সন্ন্যাসীর বেশে শরতের উৎসবে পথে বের হয়েছেন। 'ঋণশোধের' উপায় খুঁজছেন তিনি। হঠাৎ উপনন্দের সঙ্গে দেখা। বালক উপনন্দ আপনমনে প্রভুর ঋণশোধে ব্যস্ত। প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার এই হলো সংযোগ, প্রাপ্তিকে বৃহৎ মানবের সঙ্গে এক করে দেখা। কবির ভাষায়, "প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয়, সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়।" এই নাটক রচনার ঠিক পরের বছর কবি রচনা করেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। এখানেই কবির বাউল মনের 'পথ' সংক্রান্ত দর্শন প্রথম সর্বতোভাবে প্রকাশিত হয়।

শারদোৎসবে যেমন ছিলেন ঠাকুরদা, *প্রায়শ্চিত্তে* পাওয়া গেল ধনঞ্জয় বাউলকে। রাজা প্রতাপাদিত্যের সন্তান উদয়াদিত্য পিতার ন্যায় লোভী, নিষ্ঠুর নন। তাই রাজত্ব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। 'সত্যদ্রষ্টা, ভগবদভক্ত, ন্যায় ও সত্যের পূজারী' ধনঞ্জয়ের পথকে অনুসরণ করার অভিপ্রায় তাঁর। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ধনঞ্জয় উদয়াদিত্যকে বলছে, "আজ রাস্তায় মিলন। আজ বড়ো আনন্দ। আজ আর ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই, আজ তুমি যুবরাজ নও, আজ তুমি ভাই।" একই দৃশ্যে বিভা জিজ্ঞেস করে যে বৈরাগী যাচ্ছেন কোথা, তিনি তাদের সঙ্গে যাবেন কিনা। উত্তরে বৈরাগী বলেন, "কোথায় যাব সে কথা আমার মনেই থাকে না। ঐ রাস্তাই তো আমায় মজিয়েছে। এই মাটি দেখলে আমাকে মাটি করে দেয়।" (করুণাময়, ২০০৮ : ৭৩)

গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে!
ওরে কার পানে মোর হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!

এই নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে করুণাময় গোস্বামী রবিঠাকুরের জীবনে পথের প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলেন,

> পথের আহ্বান রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকে তীব্র টানে টেনেছে। এই পথ নেমে এসেছে উপনিষদের অমৃতময় লোক থেকে। এই পথ জগতের ধুলোবালির ভেতর দিয়ে গাছগাছালি ডিঙিয়ে অমৃতধামের দিকে যাচ্ছে। এ পথ মুক্তির পথ। পথযাত্রা সবাইকে পথিক করে দেয়, কোনো ভেদাভেদ থাকতে দেয় না, পথ সবাইকে চলার আহ্বানে উদ্বেলিত করে। (করুণাময়, ২০০৮ : ৭২)

১৯২২ সালে 'লিপিকায়' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।"

এভাবেই রবিঠাকুরের সাংগীতিক জীবনে, বিশেষ করে পূজা পর্যায়ের গানগুলোর রচনায় 'পথ' প্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্জগতের একটি সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে যখন তিনি *গীতবিতান*-এ তাঁর রচিত সকল গান সংকলন করেন, ভাবের দিকে লক্ষ রেখে গানের ক্রম বিন্যস্ত করার কারণে অবধারিতভাবে 'পথ' বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাই পূজা পর্যায়ের ১৯শ উপপর্যায়ের নাম দেন 'পথ'। প্রেম পর্যায়ের গানগুলোতেও 'পথ' প্রসঙ্গ এসেছে, প্রকৃতি পর্যায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু পূজা পর্যায়ের ভাবের সঙ্গে পথ সংক্রান্ত দর্শনের যেন এক ভিন্ন সখ্য। তাই 'পথ' নামে একটি উপপর্যায় থাকার পরেও বাকি সবগুলো উপপর্যায়ে পথের প্রসঙ্গ এসেছে একদম অবধারিতভাবে।

পূজা পর্যায়ের প্রথম উপপর্যায় 'গান'-এ সর্বতোভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'গান' তথা সুরের মাহাত্ম্য। রবীন্দ্রনাথ সুরের গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে জীবনের যাত্রাপথে একে একে যে বিচিত্র ধ্বনি ও সংগতি আপনার জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন, তারই আলোকে দৃষ্টি রেখেছেন হৃদয়জগতে। ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বের এবং বিশ্বের সঙ্গে মানবহৃদয়ের অবিচ্ছিন্ন সংযোগই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে সুরের মালা। প্রাচীন সাহিত্য, বৈদিক গ্রন্থ কিংবা তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজেও ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতির ঐক্য প্রকাশক সুরের ঐকতানের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এই ধারাকেই নতুন করে সৃষ্টি করলেন। এ উপপর্যায়ে মোট গান আছে ৩২টি। একটি লক্ষণীয় গান :

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান
পথে চলি, সুধায় পথিক, 'কী নিলি তোর দান!'
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২)

পরমাত্মার পথে সবাই চলছে একসঙ্গে। তাঁরই বাঁশির সুরে পার্থিব জগতকে বিদায় জানানোর তান যখন বাজলো, শেষ হয়ে এলো সংসারের আড়ম্বরপূর্ণ সাংগীতিক আয়োজন। শেষ অর্ঘ্যের প্রসঙ্গে কবি 'গানটি শুধু নিলেম গলায়' বলে জানালেন যে, সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করে হৃদয়ের সুরটুকুকে একমাত্র অবলম্বন করে নিয়েছেন তিনি। সংসারের পথের প্রান্তে বাউল মনের বৈরাগ্য খানিকটা প্রকাশিত হয়েছে এ গানে। ১৯১৪ সালে শিলাইদহে অবস্থানকালে লেখা গানটি। ২৪ সংখ্যক গানে তিনি পথের চিত্রকল্প একদম পাল্টে নিয়েছেন। এবার তিনি নিজে পথে নামেননি, ঈশ্বরকে করেছেন পথিক।

গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২)

পরবর্তী উপপর্যায় হলো 'বন্ধু'। এতে গানের সংখ্যা ৫৯। ঈশ্বরকে পরম বন্ধু বলে কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের কণ্টকময় পথে তিনি এমনই এক বন্ধু, যার কাছে অকপটে নিজেকে মেলে ধরা যায়। সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে 'পান্থজনের সখা' করে তাঁকে হৃদয়ের মাঝে বিলীনরূপে ভাবা যায়। সে বন্ধুর কাছে অক্ষমতা প্রকাশের কোনো অজুহাত লাগে না।

সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে খুঁজে না পাই দিশা।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২)

এই সমস্যাকীর্ণ জীবনের পথে যখন সমস্তকিছু থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখনই পথের মাঝে কবি ঈশ্বরের বীণার সুরে আত্মজাগরণের উপায় খুঁজে ফেরেন। শিলাইদহে অবস্থানকালে লিখছেন—

অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন সুরে আপনি নিমগন।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১৬)

৫১ সংখ্যক গানে কবি পরম বন্ধুকে পথের ক্লান্তি নিয়ে নিজের কাছে আসতে দেখেছেন। চিরকাল ধরে তিনি আমায় ভালবাসছেন, আমার কাছে আসছেন। আমিই শুধু তাঁকে বুঝতে অক্ষম। ভাগ্যাহত হয়ে চেয়ে আছি তাঁর করুণার আশায়, অথচ তাঁর অপার প্রেম বুঝতে পারিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণও—

পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯:১১৯)

ঈশ্বরকে বন্ধু করে হৃদয়ের মাঝে পেলে তবেই জাগে প্রার্থনার ভাব। তখন পথের ক্লান্তি কিংবা আনন্দ- সবকিছুই তাঁর চরণে সমর্পণ করে মুক্ত হওয়া যায়। এভাবেই 'বন্ধু' উপপর্যায়ের পরে আসে 'প্রার্থনা' উপপর্যায়। এতে গান আছে মোট ৩৬টি। একটি বহুল শ্রুত গান :

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে ?
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ২০)

মিলনের পথে ঈশ্বর অবারিত রেখেছেন দ্বার। কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়ে গেছে দেরি। তাই নিরুপায় হয়ে আকুল প্রার্থনায় পথের ত্রুটি ঘুচিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা কবির মনে। পথের মাঝে কেন এরূপ বাধা— এমন প্রশ্নও আসে কবির মনে। ১১৭ সংখ্যক গানে বিবিধ পথে নতুন নতুন সংকটের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পথে ঈশ্বরের পানে যাত্রার জন্য প্রার্থনা করছেন তিনি।

আমারে রহে যেন না ঘিরি, সতত বহুতর সংশয়ে
বিবিধ পথে যেন না ফিরি, বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৩৪)

এই গানটির সঙ্গে তুলনীয় জালালউদ্দিন রুমীর নিম্নোক্ত গানটি :

তন্ ও জাঁ, ও জাঁ ও তন মসতূর নিস্ত লায়কে কসরা দিদে জাঁন মসতূও নিস্ত।
(মোতাহার, ২০১১ : ৪)

অর্থাৎ, দেহ থেকে আত্মা বা আত্মা থেকে দেহ তো সঙ্গোপন বা প্রচ্ছন্ন নয়। কিন্তু বাধা এইখানে যে, আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করা (এখনও) মানুষের ভালো করে রপ্ত হয়নি।

গান দুটির খুব সূক্ষ্ম একটা মিল রয়েছে। রবিঠাকুর ঠিক এই গানটিকেই অনুসরণ করেননি, কিংবা হয়তো কোনো সুফি শ্লোকই অনুসরণ করেননি। কিন্তু তাঁর মনে এমনই কিছু তত্ত্ব তথা দর্শন ছিল, যা উপরিউক্ত সুফি কাব্যাংশের সঙ্গে মিলে যায়। গানটিতে চঞ্চল মনকে শান্ত করার প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্ত সর্বদা মানুষের মন তার আজ্ঞানুবর্তী হয় না। দিকহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং একসময় ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। পথে প্রান্তরে ভ্রমণ যখন সমাপ্ত হলো, তখন কবির প্রার্থনা :

এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহো॥
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৩৫)

এমনি করে কখনো পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য, কখনো পথ খুঁজে পাবার জন্য, আবার কখনো পথিকের সাথি হবার জন্য কবির আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে এ উপপর্যায়ে। এর পরে আসে উপপর্যায় 'বিরহ'। বিশ্বমানবের হৃদয়ে একটা চিরকালের বিরহভাব সর্বদা বিরাজ করে। এই বিরহ পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হবার বিরহ, অসীমের সঙ্গে সীমার বিচ্ছেদের বিরহ, পরম বন্ধুর থেকে বিচ্যুত থাকার বিরহ। মিলন খণ্ডাংশে আরাধ্যের উপস্থিতি জানান দেয়। কিন্তু বিরহ অনন্ত মহাকালের একটি অনুষঙ্গ হয়ে মানবের যাত্রার প্রতিই ইঙ্গিত করে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ পূজার গানে বিরহের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং করুণা সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছেন। জীবনের পূর্বাহ্নে (১৮৯৫ সালে) লিখেছেন চিরবিরহী সায়াহ্নের গান :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৪৩)

ভক্ত ও ভগবানের চির বিরহের উপলব্ধি কি কেবলই ভক্তের হৃদয়ে? রবীন্দ্রনাথ তেমনটা মনে করতেন না। অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে' বলে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, চির বিরহের এই অনুভবের দ্বারা ঈশ্বরও ফিরে ফিরে আসেন ভক্তের কাছে। তাই তো ভক্তের মনে বাজে সুর :

ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৩৭)

এখানে ঈশ্বর স্বয়ং পথিক। তাঁর চলার পথের ধুলায় আরাধনা ও মুক্তির আশায় কবি নিজেও ব্রতী হতে চান। ১৪২ সংখ্যক গানে লিখেছেন :

বসবো তোমার পথের ধুলার 'পরে
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৪১)

১৫৯ সংখ্যক গানেও প্রায় একই আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কবি পথ চেয়ে আছেন, জানেন না সে পথ আদৌ চিরকালের বন্ধুর সঙ্গে বিরহের অবসান ঘটাবে কি না!

পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে
তোমায় আমায় প্রাণের বঁধু, মিলব গো একসাথে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৪৬)

এই গানটির মূলভাবের সঙ্গে মিল আছে রুমীর আরেকটি বয়েতের :

জুমলা মা'শুক আম্ত, আশিক পর্দায়ে
যিন্দা মা'শুক আম্ত, আশিক মুর্দায়ে॥

এর অর্থ নির্ণয় করেন কাজী মোতাহার হোসেন এভাবে : "প্রিয়াস্পদ অখণ্ড পরিপূর্ণ রাগিণী, প্রেমী তার একটি স্বর বা পর্দা মাত্র। প্রিয়াস্পদ সদা জাগ্রত, প্রেমী ত অচেতন– তাকে জাগালে তবেই সে জাগে।" (মোতাহার, ২০১১ : ৪)

বিরহের পরে আসে 'সাধনা ও সংকল্প'। ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সত্যিকারের মিলন-বিরহের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা হলে সাধনার দ্বারা সেই বোধের উত্তরণ এবং সংকল্প দ্বারা উদ্দেশ্যের ভিত তৈরি হয়। ১৮৬ সংখ্যক গানে কবি লিখছেন :

যে পথে ধাই নিরবধি
সে পথ আমার ঘোচে যদি
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে।

পথ ভুললে তবেই ঈশ্বরের পথটি চেনা যায়। তাই যেখানে চেনা পথের সমাপ্তি, সেখান থেকেই তাঁর পথের সূচনা। এ হলো সাধনারই একটি রূপ। এর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকতে হয় চিরমুক্তির উদ্দেশ্যে। ১৯০ সংখ্যক গানে মুক্তির জন্য 'পারের পানে' বহমান পথকে অনুসরণ করার কথা বলেন কবি :

এই কথাটা ধরে রাখিস, মুক্তি তোরে পেতেই হবে
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৫৩)

এর পরে আসে উপপর্যায় 'দুঃখ'। রবিঠাকুরের সমগ্র জীবনই নানামুখী দুঃখ দ্বারা আবৃত ছিল। প্রিয়জন হারানোর দুঃখ, সন্তান হারানোর দুঃখ, অসহযোগিতা পাওয়ার দুঃখ প্রভৃতি প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন করে গড়ার প্রত্যয় ছিল তার মাঝে। তাই জাগতিক দুঃখবোধকে সৃষ্টিতত্ত্বের অনুভবের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। ধর্ম প্রবন্ধ সংকলনে তিনি 'দুঃখ' নামক প্রবন্ধে বলেন, "দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।" (করুণাময়, ২০১৩ : ১৩৭) ২০৫ সংখ্যক গানে কবি লিখছেন :

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিলে তারে
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৫৬)

পথের মাঝে ঈশ্বরকে ভুলে গেলে গভীর অন্ধকারে আবার পথ খুঁজতে হয়। তবু স্থবিরতাকে গ্রহণ করা অনুচিত। ভুল হবে, পথে ভ্রান্তি আসবে, হয়তো দুঃখভারাক্রান্ত মনে ঈশ্বরও ছলনা করছেন বলে মনে হবে :

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬০)

এরপর কবি 'দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখ, কত শোকদহন/গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান' (পূজা পর্যায়, ২৫০ সংখ্যক গান) বলে 'আশ্বাস' খোঁজেন আপনার মাঝে এবং আত্মবোধের জাগরণ ঘটার একটি প্রচ্ছন্ন আশা দেখা যায় কবির মনে। 'আত্মবোধন' উপপর্যায়ের একটি গান :

চলিস নে পথ মেপে মেপে
আপনাকে দে নিখেল ব্যেপে
যে ক'টা দিন বাকি আছে
কাটাসনে আর ঘুমের ঘোরে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬৮)

গানটির রচনাকাল ১৯১৩, স্বরলিপিতে রাগ হিসেবে উল্লেখ আছে 'বাউল সুর'। বলা হয়ে থাকে, 'আউল' শব্দটি থেকে এসেছে 'বাউল'। অর্থাৎ, আপনার দিকে বেখেয়ালি যে। এই কথাটিরই একটি রূপ দেখতে পাই উপরের গানটিতে। রচনাকাল অনুযায়ী রবিঠাকুর তখন বাউল দর্শনে একদম আত্মহারা হয়ে আছেন। জীবনের চলার পথে তাই বাউলদেরই মতো বেখেয়ালি হতে চান।

আত্মবোধনের পরে আসে উপপর্যায় 'জাগরণ'। এ উপপর্যায়ের একটি গান :

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,
দিসনে তারে ফাঁকি।
... ...
পথে পায়ে পায়ে দুঃখের বাঁশরি বাজবে তোরে ডাকি
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬৯)

গানটি রচনা শিলাইদহে বসে, সুর করা রাগ পিলুর আশ্রয়ে। এতে বাউলের প্রভাব অত্যন্ত সহজভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'কঠিন পথের শেষে' পরম বন্ধু একা বসে আছেন। একদিন সব ছেড়ে তাঁরই উদ্দেশ্যে হবে যাত্রা। জাগরণের এই অনুভূতি পূর্ণতা পাবে 'নিঃসংশয়' স্থিতিতে এসে। অর্থাৎ, পথ অজানা হলেও যাত্রা সুনিশ্চিত।

অবোধ আমি ছিলেম বলে, যেমন খুশি এলেম চলে
ভয় করিনি তোমায় আমি অন্ধকারে।
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যা রে।"
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৭৩)

পরবর্তী 'সাধক' এবং 'উৎসব' উপপর্যায় দুটিতে তেমন কোনো 'পথ' সংক্রান্ত গান নেই। এর পরে আসে উপপর্যায় 'আনন্দ'।

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৮৩)

এই গানটি রচিত কীর্তনের সুরে, ১৮৯৯ সালে। 'আনন্দের' পরে আমরা উপপর্যায় পাই 'বিশ্ব'। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের এতগুলি স্তর পার হয়ে এসে তবে রবিঠাকুর 'বিশ্ব' উপপর্যায়ের স্থান নির্ধারণ করলেন। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সত্যিকারের সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়, তখন নিজের সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক বোঝা সম্ভব হয়। এই উপপর্যায়েও 'পথ' শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে।

যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে পথতলে পড়িব লুটে...
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে॥
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৮৯)

পরবর্তী উপপর্যায় হলো 'বিবিধ'। বিশিষ্ট সংগীতবোদ্ধা করুণাময় গোস্বামী মনে করেন, এই নামে আলাদা একটি উপপর্যায় না রাখলেও চলত। তিনি বলেন, "... পরের ১৪৩টি গানকে কেন রবীন্দ্রনাথ বিবিধ উপশিরোনামে সংকলিত করতে গেলেন বোঝা গেল না। এ গান থেকে অনেক গানকে আগেকার উপশিরোনামসমূহে অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন।" (করুণাময়, ২০১৩ : ১৪৭) এ উপপর্যায়ে যে গানগুলোয় পথের প্রসঙ্গ আছে, সেগুলোতেও কোনো ঐক্য নেই। পরবর্তী উপপর্যায় 'সুন্দর', তারপরে আসে 'বাউল'। 'বাউল' উপপর্যায়ে গান আছে মাত্র ১৩টি। অথচ রবিঠাকুরের সমস্ত জীবনজুড়েই রয়েছে বাউলের প্রভাব, বিপুল সংখ্যক গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রয়েছে বাউলের ছায়া। এ উপপর্যায়ে পথ সংক্রান্ত একটি গান :

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি খুঁজে তারে পায় কি আঁখি
এখন, পথে ফিরে পাবি কিওে ঘরের বাহির করলি যারে।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২৭)

বাউলের পরে আসে উপপর্যায় 'পথ'। এতে গান আছে মোট ২৫টি। পথকে তিনি কোনো কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তার বেশ কিছু উদাহরণ সন্নিবেশিত আছে এখানে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এ উপপর্যায়ের সবকটি গানের রচনাকাল ১৯১২ থেকে পরবর্তী সময়। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি 'গীতাঞ্জলির' যুগে যেই আধ্যাত্মিকতার ধারায় স্নান করেছিলেন এবং তারই ফলে পরবর্তী জীবনে গান রচনা করেছিলেন, 'পথ' উপপর্যায়ে সেই বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ উপপর্যায়ের প্রথম গানটিতেই আনন্দের সঙ্গে কবি জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পথ চলা শুধুই উপভোগের, শুধুই সাধনার :

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া বর্ষা আসে বসন্ত।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১২৯)

এ উপপর্যায়ের গান সম্পর্কে করুণাময় গোস্বামী বলেন,

> ... পথ তাঁর রচনায় গতি, অভিযান, রহস্য ও অনন্তের প্রতীক। পথ এখানে অনন্তের পথে যাত্রা পথ, রাজপথ, স্বয়ং বিশ্বরাজধামের দিকে যাচ্ছে এই পথ। এ পথ জীবনপথ। কেউ জানে না এই পথ যাত্রা কবে আরম্ভ হলো, কবে এই যাত্রা শেষ হবে। (করুণাময়, ২০১৩ : ১৫১)

'শেষ' উপপর্যায়ে অবধারিতভাবেই পথের প্রসঙ্গ এসে যায়। জীবনের পার্থিব অধ্যায়ের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে অনন্ত অসীমের সঙ্গে মিলনের যাত্রায় কবি ঈশ্বরের বাঁশির ডাক শুনে যখন উতলা, পথের পথিকদের কাছে জানতে চান পথের দিশা। কেউ ঠিক কথাটি বলে না, কবি নিজেও পথের সন্ধান ঠিকঠাক অনুধাবন করতে পারেন না। তবু পথ চলেন, তবু আশায় বুক বাঁধেন।

> শুধাই যত পথের লোকে– 'এই বাঁশিটি বাজালো কে?'
> নানান নামে ভোলায় তারা নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে।
> (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ১৩৯)

পথের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারলেই পথচলা হয়ে ওঠে সহজ এবং সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলোতে জীবনের পথকে আপন করে পাবার, আনন্দের সঙ্গে সেই পথে চলার বাণী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গ্রন্থিত রয়েছে। যে কেউ এই গানগুলোর মর্ম অনুধাবনের দ্বারা জীবনের জটিল পথকে সহজ করে নিতে পারেন।

বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রসংগীত এমন একটি স্থান লাভ করেছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা গানের মোটামুটি সব ধরনের উপাদান নতুন রূপ পেয়েছে, এক ধরণের পূর্ণতা লাভ করেছে। গানগুলোতে বাংলার কীর্তন, বাউল ও সুফীতত্ত্বের মূল ভাবটি পুরোপুরিভাবে দৃশ্যমান না হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই সকল ধারার গানে ও দর্শনে পারস্পরিক মিল অভাবনীয় এবং অপূর্ব। এরই ধারাবাহিকতায় 'পথ' শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ও ক্ষেত্রবিশেষে অর্থের পার্থক্য নিরূপণের প্রচেষ্টার দ্বারা পূজা পর্যায়ের গানে 'পথ' সংক্রান্ত দর্শন নিয়ে রবিঠাকুরের নিজস্ব চিন্তাধারার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হলো । *গীতবিতান*-এর জগতে এমনি আরও অনেক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ রয়েছে, যা থেকে কবিগুরুর জীবনদর্শনের অনেক বৈচিত্র্যময় দিক আবিষ্কার করা সম্ভব।

সহায়কপঞ্জি

আফসার আহমদ (২০১৮)। 'রবীন্দ্রনাথের গানে পথ ও পথিক'। *কালের খেয়া*।
আবদুশ শাকুর (২০১২)। *রবীন্দ্রজীবন* (২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
আহমদ রফিক (২০১৬)। *রবীন্দ্রজীবন* (৩য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
আহমদ রফিক (২০১৬)। *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।
করুণাময় গোস্বামী (২০০৮)। *রবীন্দ্র নাট্যসংগীত*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
করুণাময় গোস্বামী (২০১৩)। *রবীন্দ্রসংগীতকলা* (১ম ও ২য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
প্রসাদ সেন (২০০৩)। *রবীন্দ্রসংগীতে মিলন মেলা*। দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
মোবারক হোসেন *সম্পা.* (২০১১)। বাংলা একাডেমির নিবেদন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মোবারক হোসেন *সম্পা.* (২০১২)। রবীন্দ্র-বীক্ষণ নানা দৃষ্টিতে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান (২০১১)। *বাংলা গান বিবিধ প্রসঙ্গ*। হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৯)। *গীতবিতান*। মলি প্রকাশনী, ঢাকা।

লীনা তাপসী খান *সম্পা.* (২০০৯)। *সংগীত শেকড়* (সংখ্যা : ১)। আন্তর্জাতিক বাংলা সংগীত কেন্দ্র।
সন্‌জিদা খাতুন (২০১২)। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ'। *রবীন্দ্রবীক্ষণ : নানা দৃষ্টিতে*। সম্পাদক : মোবারক হোসেন। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
সন্‌জিদা খাতুন (২০১৬)। *রবীন্দ্র বিশ্বাসে মানব অভ্যুদয়*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।
সুচিত্রা মিত্র *সম্পা.* (১৯৮৯)। *রবীন্দ্রসংগীতায়ন*। প্যাপিরাস, কলকাতা।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৪২৩ বঙ্গাব্দ)। *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1250 date : 19th march 2019.